অহনা চলে গ্যাছে

শাহ্‌জাহান চঞ্চল

অহনার সাথে আমার পরিচয়টা অন্য দশটা ঘটনার মতোই অতি সাধারণ। কবিতা লিখি, কবিতা পড়ি। কবিতা অনুষ্ঠানেই অহনার সাথে পরিচয় । সেও কবিতা লেখে, পাঠও করে ভাল। অনুষ্ঠান শেষে অহনা ও আমি মুখোমুখি।
– সালেমালাইকুম। অহনা মুখে পরিমিত হাসি মেখে হাতটা একটু মুখের কাছে তুলে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে।
– ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুলাহে ওয়া বারাকাতুহু। আমি সালামের প্রতিউত্তরে পুরোটাই বলি।
– ওমা এতো লম্বা জবাব। অহনা বলে।
আমি বলি – নয়তো কি ?
অহনা বলে আজ তবে আসি। ব্যস কথাবার্তা সেদিনের মতো শেষ। এরপর কাকতালীয়ভাবে কয়েকটা অনুষ্ঠানেই পরপর দেখা হয়ে গেল অহনার সাথে। দেখা হওয়ার সংখ্যা যতো বাড়তে লাগলো ,তাঁর নানা গুণগুলিও সামনে এলো। শুধু কবিতাই নয়, গাইতে পারে, আঁকতে পারে, নৃত্যকলাও রপ্ত। রাধতেও যে ভালো পারে সেটা তাঁর বাসাতে আমন্ত্রিত হয়েই বোঝা গেল। এসব ছাপিয়ে যেটা আমার ভালো লাগলো সেটা হলো অহনা শিল্প সাহিত্যের একজন মিষ্টিভাষী আলোচক।

এরপরের ইতিহাস অহনার সাথে আমার সখ্য, দারুন সখ্য। দেখা হলে কথাবার্তা এমনটি নয় আর এখন। আমরা দূরাপালনীতে আলাপ করি নানা বিষয়ে। কি নেই সেই আলাপে। শিল্প-সাহিত্য,যুদ্ধ-বিগ্রহ, সৃষ্টি রহস্য, সমাজবাদ আরো শত কিছু। কিন্তু লক্ষ্য করি সব আলাপ ছাপিয়ে নষ্টালজিক বিষয়েই অহনার পক্ষপাতিত্ব। দেশ তাঁর কাছে মায়ের কোলের মতো। অতীতের সব কিছুই তাঁর কাছে স্বর্ণচাঁপা। প্রায় সময়ই ডেকে আনে তাঁর শৈশব কৈশোর। আমাকেও তাঁর সাথ দিতে হয় । অহনার নাকে দোলে কিশোরীর নোলক, আমার হাতে বাজে কিশোরের ঢোলক। আমরা দৌড়াতে থাকি স্মৃতিভেজা ঘাস মাড়িয়ে, দূরে, বহুদূরে। গিয়ে বসি শ্যাওলা ধরা দিঘির ঘাটে। দিঘির চারপাশে চালতা গাছের সারি। পাতা মরে টুপ করে পড়ে। মরা পাতার ঝরা রক্তে বাদামী রঙ ধরেছে দিঘির জলে। পা ডুবিয়ে বসে থাকি আমরা সে জলে। মাছের ঘাঁইয়ে জলের শরীরে রঙধনু হয় তৈরি। অহনা আনন্দে লাফিয়ে উঠে– দ্যাখ, দ্যাখ কতো বড় মাছ। আমি বলি বড় না ছাই , কোন চুনুপুঁটি হবে। অহনা আমাকে হ্যাঁ করে জিব ভেংচায়। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে অহনা আবার কথা শুরু করে।
– জানিস, চালতা গাছে না ভূত থাকে।
– কে বলল তোকে? আমি জিজ্ঞেস করি।
– ছোট চাচা বলেছে। অহনা উত্তরে বলে।
– কবে বলেছে? আমি ফের জিজ্ঞেস করি।
- ছোটবেলায়।
– আচ্ছা প্রাগৈতিহাসিক যুগে। আমি মজা করার জন্য বলি। অহনা রাগ করেনা আমার কথাতে। সে বলে-
– হু। জানিস?
– আমি জানবো কি করে তুই না বললে । অহনা বলে-ছোট চাচা আমাকে কাঁধে ঝুলিয়ে মামা বাড়ি নিয়ে যেত। মামা বাড়ির কাছে একটা চালতা গাছ। সেখানে এলেই চাচা বলতো এই অহনা এই চালতে গাছে ভূত আছে। আমি ভয়ে চোখ বুঁজে রাখতাম। চোখ খুলতাম মামা বাড়ির উঠানে পৌঁছে।
- এই দিঘির পাড়ের চালতা গাছগুলোতে কতগুলি ভূত আছে তুই জানিস। আমি অহনাকে জিজ্ঞেস করি।
– না।
– একশো তো হবেই। তোকে এই ভূতের রাজ্যে রেখে আমি যাচ্ছি কেমন?। অহনা একটু যেন ভয় পায়। আমার গাঁ ঘেঁষে আসতে গিয়েও আবার দূরে সরে যায়। সাহস টেনে বলে – আমি এখন আর ভূতকে ভয় পাই না।
– সেই ভালো। আমি হাসতে হাসতে বলি। হাসির দমকা বাতাসে কল্পনার চাদরটা উড়ে যায় দূরে।

জলের ধারে বসে কখনো কখনো অহনা রবি ঠাকুরে হয় মগ্ন। তখন সে হয়ে উঠে লাবণ্যর বয়সী । অমিয় ভাষায় পাঠ করে “ ... আমারে যে দেখিবারে পায়, অসীম ক্ষমায়, ভালমন্দ সকলি মিলায়ে।” রবির ব্যাপারে সে বেশ ভালজানে। মনে হয় কাদম্বরী দেবী বা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো সে নিজেই। রবির দোলায় সে দোলে। দোলবে হয়তো জীবন ভরেই।

যুদ্ধ বিগ্রহ নিয়ে কথা উঠলে অহনা ভিন্ন মানুষ হয়ে যায়। মুক্ত প্রতিবাদী হয়ে উঠে সে। কিন্তু ঘৃণার প্রকাশটাকে করে পরিমিতভাবে। তাঁর দর্শন – মুক্ত ক্রোধ, সুস্থ ঘৃণা। অতীতের সব যুদ্ধবাজ নায়কদের সাথে বুশকেও সে ঘৃণা করে। বুশের বিশেষণ হিসেবে হারামজাদা শব্দটা ব্যবহার করে। তাঁর কথা মানুষ যুদ্ধ করবে কেন? সেই মানুষ যে কিনা চন্দ্র বিজয় করেছে, ধাবিত হচ্ছে মঙ্গল গ্রহের দিকে। পৃথিবীকে এনেছে হাতের নাগালে। মুঠো ফোনের ছোট সীমের মধ্যে বন্দী করেছে সময় যোগাযোগ, বিনোদন সবকিছুকে। অমিত সম্ভবনার মানুষ কেন যুদ্ধাস্ত্র বানাবে আরেক মানুষকে মারার জন্যে ? অহনার এই বোধের কাছে আমি শ্রদ্ধায় নত হই। অহনার সাথে আমার সম্পর্ক দাঁড়ায় সাতরঙ। আমরা আমাদের সম্পর্কাকে একটা উমুক্ত চেকের মতো রেখে দেই। আমাদের দুজনের সম্মতি স্বাক্ষর আছে তাতে। কিন্তু সম্পর্কের অংকটা কি তা লিখার কোন দরকার পড়ে না। বিভিন্নজন বিভিন্ন গল্পের অবতারণা করে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে। তা নিয়ে প্রতিবাদের কোন প্রয়োজনও মনে করিনা আমরা। আমারা জানি স্বর্গের মাকড়শার বোনা পবিত্র ভাবনা দিয়ে আমাদের সম্পর্কটা আচ্ছাদিত। এ প্রসংগে অহনা মাঝে মধ্যে বলে- কুছ লোগ কহেগা। লোগকো কাম হে কঁহেনা, ওছিকো কঁহেনে দোঁ। তবে আমাদের একটা দোষ আছে আমরা কথা বোধহয় একটু বেশি বলি। কথার সুতোয় পা দিয়ে আমরা সার্কাসের এক্রোব্যাটদের মতো পাড় হই শূণ্য পথ। কল্পনায় ভাসি আমরা। আকাশ থেকে আরেক আকাশে যাই। খুঁজি আকাশের উপর আকাশ। নোভা সুপার নোভা পেরিয়ে আমরা শেষ নক্ষত্রের কার্নিশে গিয়ে পা ঝুলিয়ে বসি। শূন্যের মধ্যে বসে পৃথিবীর মতো আর কোন পৃথিবী খুঁজে পাই না। অহনা পৃথিবীতে ফেরার জন্য পাগল হয়ে উঠে। বলে সে–
– আমি কি অন্ধ হয়ে গেলামরে ? ফুল, পাখি,পাতা কিছুই যে দেখিনা চোখে।
– চল ফিরে যাই আমাদের নিজেদের পৃথিবীতে । কাজ নেই শূন্যে বসে থেকে। অহনার কথার পিঠে বলি আমি।
অহনা দৌড়ে যায় জলের উৎসের দিকে। আজলা ভরে তৃষ্ণা মিটায়, চোখে ছিটায়, পা ভিজায়। মনে হয় যেন সে সত্যি সত্যি কোন দূর গ্রহ থেকে এইমাত্র তাঁর প্রিয় পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। পরক্ষণেই গোত্তা খাওয়া ঘুড়ির মতো কাত হয়ে অহনা দৌড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ফসলি মাঠে। সবুজের গায়ে সে হাত বুলায় । নিজের হলুদ গালের সাথে সবুজের স্পর্শ মিশায়। এ দৃশ্য দেখলে যে কারো সবুঝ ফসল হয়ে যেতে ইচ্ছে হবে অহনার স্পর্শ পাওয়ার আকংখাতে। কিন্তু অগস্ত্যা মুনির মতো আমি ধ্যানমগ্ন থাকি নিজের মধ্যে। অহনা চোখের কাজল ঢালে জমির আলে । বেণী থেকে লাল ফিতা খুলে আমার হাতে দিয়ে গেয়ে উঠে – " আমি কব কথা শিশিরের সনেরে ভ্রমরা।" আমি হাসি রবীন্দ্রনাথের মতো স্মীতভাবে। অহনা আমাকে ডেকে বলে – ও কবি! বাঁশি বাজাতে জানো? বাঁশের বাঁশি। জানলে বাঁজাও । আমি তোমার বাঁশির সুরে নাচি। অহনার এ কথায় গলা ছেড়ে হেসে উঠি আমি। অহনাও হাসে। সে হাসিতে শিমুলের লাল ফুল ঝরে মাঠের পরে। অহনা মাটি থেকে শিমুল ফুল তুলে নেয় হাতে তারপর আবার ছুঁড়ে দেয় উপরে আকাশের দিকে। কিন্তু শিমুল ফুল যে আকাশকে ভালবাসে না, ভালবাসে মাটিকে। ফিরে আসে মাটিতেই। অহনা আমার খুব কাছাকাছি এসে বলে –
–একদিন আমরা চাঁদের প্রদীপ জ্বেলে রাত তাড়াবো এই শিমুলের নিচে বসে। শঙ্খভোরে নদীর জলে মুখ ধুয়েবাড়ি ফিরবো তবে।
– অহনারে, তুই কিন্তু রোমান্টিসিজমের শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। আমি বলি অহনাকে। অহনা একটু হাসে। তখন কাকতালীয়ভাবে আকাশ থেকে শাদা শাড়ি পরা পরীরা নামে, বৃষ্টি নিয়ে। সে বৃষ্টি ধানের ক্ষেতে নাচে। বাবুইয়ের বাসা দেয় ভিজিয়ে। জল ছিটায় মাঠ ভরে। তই তই, কৃষাণীর স্বর ভাসে দূরে।
অহনা বৃষ্টিতে ভিজে। বৃষ্টির জলে ছন্দ করে পা ফেলে। তার পায়ের আদরে শিশু দূর্বা খিলখিলিয়ে হাসে। অহনা গেয়ে উঠে-
– " আমাকে দেখতে যদি তোমার সাধ হয়, তবে বাংলার মুখ তুমি দেখে নিও। এখানে বৃষ্টি ঝরে রিমঝিম শ্রাবণের সেতারে...।" আমি অহনার মাঝে প্রকৃতি দেখি। হাতে পাই নতুন উপলব্ধির জীয়নকাঠি। "... এখনো সে যে কোন নারী"- মনের তসতরিতে সাজিয়ে রাখা সুনীলের কবিতার এই লাইনটি আমি লুকিয়ে ফেলি। অহনাকে কেবল নারী মনে হয়না আমার কাছে।। আমি শব্দ করি না। কিন্তু মনের মধ্যে গড়ে উঠে এক নদী । যে নদীর স্রোত শো শো শব্দ করে বলে অহনা ,অহনা, অহনা তুমি প্রকৃতি। তখন একটি কবিতা লেখা হয়ে যায় ।

চিত্রা নদী খরস্রোতা বড়ো
ওপারে দাঁড়িয়ে তুমি;
থাক ওখানেই
সময়ের সুরঞ্জনা হয়ে...

এপাড়ে রৌদ্র দ্বীপ নেই
মেঘে মেঘে চৌরঙ্গী চাতালে
গজিয়েছে ঘাস;
চোরাকাঁটা বেশুমার তাতে...

দূরেই থাক অহনা
শাড়ির পাড়ে
মৌটুসী কবিতার ঢেউ তুলে....

সাত ঘড়ি বসে বসে অহনা আর আমি পরিকল্পনা করি। এখানে যাবো, সেখানে যাবো। শেষ মেষ ঠিক হয় বরিশালে তো যাবই যাবো – জীবনানন্দের জন্মভিটা দেখতে। অহনা জীবনানন্দের দাওয়ায় বসে পুকুর দেখবে। আমি কবিতা লেখবো সুপারি গাছের নিচে বসে। ত্রিশালে যাবো নজরুলের শৈশবের কিছু স্মৃতি খুঁজতে। আমি হুক্কা খাবো গাছের উপ চড়ে। অহনা তখন রৌদ্র কুড়িয়ে আঁচলে ভরবে। মধু মেলায় যাবো। অমিত্রাক্ষর বাঁশি কিনবো। মধুর আঙিনা থেকে শব্দ কুড়াবো। সুলতান মেলাতেও যাবো আমরা। সুলতানের পানসিতে চড়ে এপার ওপার হবো চিত্রা নদী। পায়ে হাঁটবো। রিকশায় চড়বো। নৌকায় পাড়ি দিব জলে ডুবা পথ। আমাদের এতোসব পরিকল্পনা গোপন রাখি নিজেদের মধ্যেই। বাস্তবায়নও করবো গোপনে। জসীমউদ্দিনের কবিতার মতো অহনাকে বলি –" কাহারেও কবিনা, দেখিস পায়ের শব্দে কেহ না জাগে।" এ বিষয় নিয়ে আমরা গোল টেলিফোন বৈঠক করি। এসব বিষয় আলোচনার জন্য আমরা লোকারণ্যের ভাষার পরিবর্তে অরণ্যবাসীদের কোন ভাষা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেই। খুমি ভাষা ব্যবহার করবো এমনটা ভাবি আমরা । খুমি অরণ্যবাসীরা সংখ্যায় খুব কম। পার্বত্য চট্রগ্রামে এবং বার্মার অরণ্যেই কেবলমাত্র এঁদের বসবাস। উভয় জায়গা মিলিয়ে এদের সংখ্যা হাজার পাঁচেকের মতো হবে। এরা খুব শান্ত প্রিয়, লাজুক। থাকে অরণ্যের গভীরে। খুমি ভাষার কোন বর্ণমালা নেই । আর খুমিরা ভাষার ক্ষেত্রে খুব রক্ষনশীল। নিজেদের ভাষা সহজে অন্যদের শিখাতে চায় না। নিজেরাও শিখতে চায় না অন্যভাষা। আমার এক বন্ধু আছে যে উপজাতিদের নিয়ে গবেষণা করে। ওকে ধরে খুমিদের কাছ থেকে ভাষাটা শিখা যাবে। ভাষাটা শিখা হলে আমি আর অহনা আমাদের তাবৎ কথা লোকারণ্যে দাঁড়িয়ে বললেও বুঝতে পারবে না কেউ। আমরা প্রতিজ্ঞা করে ফেলি, খুমি ভাষাটা শিখবোই শিখবো ।

আমরা জোর কদমে প্রস্তুতি নিতে থাকি আমাদের ছেলেমিগুলো বাস্তবায়নে। কিন্তু প্রকৃতি হাসে। আমার মনের মধ্যেও তৃতীয় চিন্তা উঁকি দেয় কখনো কখনো। এসব কিছু কি হবে ? সত্যি সত্যি হয়না। শুরু হওয়ার আগেই স্থগিত করতে হয় সব। অহনা চলে যাবে দূর প্রবাসে। অভিবাসী হয়ে। অহনাকে বিদায় জানাতে যখন ওদের বাড়িতে যাই ,
...গাড়ি প্রস্তুত দ্বারে, বেলা দ্বিপ্রহর.. ।"
আমার বুক ভরা তখন কষ্ট। অহনার ঘর ভরা মানুষ। ব্যালকনীতে ডেকে নেয় অহনা আমাকে। চোখ চলছল ওর। আমাকে বললো – ভুলবি না কখনো আমাকে। ওর হাত দুটো আমার হাতকে স্পর্শ করতে এসেও সরে গেল। সরিয়ে নিল অহনা নিজেই।
আমি পথে নেমে এলাম। পিছনে তাকালাম না আর ফিরে। কি লাভ কষ্ট বাড়িয়ে। কিন্তু অনুভব করলাম অশ্রুভেঁজা দুটি চোখ ব্যালকনীতে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে ।